ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ৩৯-৫০
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4104

শাহজাদপুরের কৃষক বিদ্রোহের (১৮৭২) নেপথ্যে জমিদার পরিবারের ভূমিকা

সুলতানা সুকন্যা বাশার
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: One of the most successful revolts in the history of resistance movement and struggle in the 19th century was the peasant revolt of Sirajganj. The special aspect of this rebellion was that the common peasants or subjects of Bengal were not against the British but against the native landlords, which is famous for many reasons in the history of the Indian subcontinent. With the positive attitude of the British, this revolt systematically culminated in a victory of the common people. The revolt was conducted through strikes and legal battles by the peasant community against unfair injustices including illegal taxation by native landlords. After the death of Dwarkanath Tagore, the founder of the famous Jorasanko family of Kolkata, his son Devendranath Tagore took charge of the Zamindari of Shahjadpur. The Peasant's Revolt took place in 1872 as a result of the inhumane treatment of the subjects by him, along with other zamindars, who imposed exorbitant taxes on the peasants and non-payment of taxes. The Bengal Tenancy Act was enacted in 1885 mainly as a result of this rebellion. The research work has been conducted to present this as one of the most successful peasant revolts in history to the present generation.

Key Words: Makhdum Shaheb, Illegal Tax, Devendranath Tagore, Ishanchandra Ray, Bengal Tenancy Act of 1885

ভূমিকা: উনিশ শতকে উপমহাদেশের চলমান আন্দোলন ও বিদ্রোহে ভারতীয়রা বেশ আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিল। তারা ব্রিটিশ বিরোধী অসন্তোষ, স্বাধিকারের দাবি এবং নিপীড়নরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল। এ আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস সুদীর্ঘ এবং ধারাবাহিক। প্রায়শই ভারতীয়রা, বিশেষ করে বাংলার মানুষ নিজস্ব দাবি দাওয়া আদায়ে সচেতন ছিলেন বিধায় বাংলা কেন্দ্রিক ব্রিটিশ সরকার বেশ চাপের মুখে থাকতো। আন্দোলনের এই ধারাবাহিকতায় ১৮৭২ সালের সিরাজগঞ্জ জেলার কৃষক বিদ্রোহ কিছুটা ব্যতিক্রমি ছিলো। কারণ, এ বিদ্রোহ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নয় বরঞ্চ দেশীয় জমিদারদের অমানবিক আচরণের প্রেক্ষিতে পরিচালিত হয়েছিল। যদিও জমিদারদের এহেন উগ্র আচরণের পেছনে ইংরেজদের সহযোগিতা রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তবে বিখ্যাত এ

বিদ্রোহের অবসান ঘটে ইংরেজদের পূর্ণ সহযোগিতায় একথা অনস্বীকার্য। বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলায় এ কৃষক বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল যা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম ভূমি সংস্কার আন্দোলনও বটে। যেখানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে হরতাল, ধর্মঘট এবং আইনি লড়াই করেছিলেন কৃষক সম্প্রদায়।

সমগ্র শাহজাদপুরে এ বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিলেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারিতে কৃষকেরা যেন স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠেছিল। মূলত, শাহজাদপুর (তৎকালীন ইউসুফশাহী পরগনা) অঞ্চলটি নাটোরের রানী ভবানীর জমিদারির অন্তর্ভূক্ত ছিল। যথাসময়ে রাজস্ব জমা দিতে ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ সরকার এ পরগনা নিলামে তোলে এবং তখন কলকাতার ঠাকুর পরিবার সহ কতিপয় ধনী ব্যক্তিবর্গ উক্ত পরগনাটি পাঁচ ভাগে কিনে নেন। নব্য এ জমিদারেরা ইংরেজ সরকার তোষণনীতির মাধ্যমে যে বিপুল অর্থের মালিক হয়েছিল সে অর্থ লগ্নি করতে দেউলিয়া প্রায় জমিদারিগুলো কিনে নিতেন। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তাঁরা এ জমিদারি কিনতেন বলেই কৃষিভূমির সব আয় এবং কৃষকের উপর অবৈধ কর চাপিয়ে দিয়ে সম্পদ বৃদ্ধি করাই ছিল মূলত তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য।[১] পরবর্তীতে কৃষক বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানে উক্ত তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। জমিদার কর্তৃক খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে কৃষকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে দেশীয় হাতিয়ারে সজ্জিত থাকতেন।

তাঁরা মাছ ধরার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত পলোকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেন বলে একে পলো বিদ্রোহও বলা হয়। উক্ত অঞ্চলের লৌকিক গানে উল্লেখ আছে-

লাঠি হাতে পলো কাঁধে চল্ল সারি সারি
সকলের আগে যায়ে, লুটলো বিশির কাচারি[২]

এ বিদ্রোহটি একাধারে প্রজা বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ বা পলো বিদ্রোহ নামে পরিচিত। আলোচ্য প্রবন্ধে এ কৃষক বিদ্রোহের পেছনে জমিদারদের বিশেষ করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে কৃষকদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা উঠে এসেছে। জমিদারি তদারকি করতে গিয়ে তাঁর অমানবিক আচরণ এখনো আমাদের চিন্তার জগতে বাধার সৃষ্টি করে। ১৮৭২ সালের এ কৃষক বিদ্রোহ পরবর্তীতে কিভাবে বিস্তার লাভ করেছিলো, এতে ঠাকুর পরিবারসহ অন্যান্য জমিদার পরিবারের ভূমিকা কেমন ছিলো এবং ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে সমগ্র ভারতে জমির উপর কৃষকেরা অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল তার বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা এ প্রবন্ধে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ এর নামকরণ ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস: সিরাজগঞ্জ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অন্যতম নদী বিধৌত জেলা হিসেবে পরিচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহ। যদিও বাংলাদেশের মানচিত্রে এর অবস্থান খুব বেশিদিনের নয়; কেননা রেনেলের মানচিত্রে যমুনা নামে একটি খালের চিত্র রয়েছে যার সাথে ১৭৬২ সালের প্রবল ভূমিকম্পের কারণে ব্রহ্মপুত্র নদ তার গতিপথ পরিবর্তন করে খালটির সাথে মিলিত হয়ে এটি স্রোতোস্বিনী নদীতে রূপান্তরিত হয়। ১৮০৮ সালে প্রকাশিত বুকানন হ্যামিলটনের ম্যাপে এ নদীকে বিশাল

নদীরূপে দেখানো হয়েছে।[৩] জানা যায় তখন থেকেই নোঙর করা জাহাজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং জনবসতিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে সিরাজগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে এবং তারও পূর্বে সুলতানি ও মুঘল আমলে ইউসুফশাহী পরগনা ও পরবর্তীতে বড়বাজু পরগনা হিসেবে পরিচিত ছিলো।[৪] পরবর্তীতে এ পরগনার জনপ্রিয় জমিদার সিরাজ আলী চৌধুরী ১৭৭৫ সালে নিজ নামে একটি নদীবন্দর স্থাপন করেন। তখন থেকে এ পরগনাটি সিরাজগঞ্জ বন্দর নামে পরিচিতি লাভ করে।[৫] ময়মনসিংহ জেলার আয়তনিক পরিধির বিশালতা হেতু প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্র বৃদ্ধির ফলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে এ বিভাজন সম্পন্ন হয়েছিলো।[৬] ১৮৪৫ সালে এটি মহকুমা হিসেবে পরিচিতি পায়।[৭] নদীর ভাঙ্গা গড়ার প্রাকৃতিক নিয়মে টিকে থাকা বর্তমান সিরাজগঞ্জ অঞ্চলটি ১৯৮৪ সালে জিলা হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী বিভাগের প্রশাসনিক অঞ্চলে পরিণত হয়।[৮] ধারণা করা হয় বর্তমানের দৃশ্যমান সিরাজগঞ্জ জেলাটি মূল অংশের চতুর্থ বা পঞ্চম সংস্করণ।[৯]

ভৌগোলিক অবস্থান: তাঁতশিল্পের প্রশংসনীয় বিস্তার, বঙ্গবন্ধু সেতু এবং সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধ এ জেলাকে খ্যাতি এনে দিয়েছে নিঃসন্দেহে। এ জেলার ৮৯°-৪২° পূর্ব অক্ষাংশে জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলা, ৯৮°-৪৪° পশ্চিম অক্ষাংশে পাবনা জেলা, ২৪°-২৮° উত্তর দ্রাঘিমাংশে বগুড়া জেলা ও ২৪°-৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশে মানিকগঞ্জ জেলা অবস্থিত। সিরাজগঞ্জ জেলা মোট ৯টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। যথা: ১.সিরাজগঞ্জ সদর, ২.কাজিপুর, ৩.রায়গঞ্জ, ৪.উল্লাপাড়া, ৫.শাহজাদপুর, ৬.বেলকুচি, ৭.কামারখন্দ, ৮.চৌহালি ও ৯.তাড়াশ।[১০] বর্তমান শাহজাদপুর উপজেলায় ১৮৭২ সালে সংঘঠিত হয়েছিল অবিভক্ত ভারতের প্রথম কৃষক বিদ্রোহ।

শাহজাদপুর উপজেলার পরিচিতি ও নামকরণের ইতিহাস: ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় বর্তমান শাহজাদপুর উপজেলা মধ্যযুগে পাবনা জেলা তথা সিরাজগঞ্জ মহকুমার একটি সুপ্রাচীন গ্রাম। ধারণা করা হয়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে কিংবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইয়েমেনের শাহজাদা বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারক হযরত মখদুম শাহদৌলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদকে কেন্দ্র করেই বর্তমান শাহজাদপুর অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠেছে।[১১] সুলতানী আমলে শাহজাদপুর 'ডিহি' বা রাজস্ব আদায়ের অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে মুঘল আমলে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিচিত এ অঞ্চলে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশের আদেশে জেলার প্রতি বিশ মাইল অন্তর একটি করে থানা স্থাপন করা হয়। মূলত তখন থেকে শাহজাদপুর থানার মর্যাদা লাভ করে। ১৯৮২ সালে এটি উপজেলায় রূপান্তরিত হয় যার মোট আয়তন হলো ৩২৪.৪৭ বর্গ কি.মি.। এর সীমানা হলো উত্তরে উল্লাপাড়া ও বেলকুচি উপজেলা, দক্ষিণে বেড়া ও সাথিয়া উপজেলা, পূর্বে চৌহালী উপজেলা এবং পশ্চিমে ফরিদপুর ও উল্লাপাড়া উপজেলা।[১২] ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে

ইয়েমেনের শাহজাদা শাহদৌলার নামানুসারে উক্ত অঞ্চলের নামকরণ করা হয় শাহজাদপুর।[১৩]

জনশ্রুতি অনুযায়ী বলা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বা চতুদর্শ শতাব্দীর শুরুর দিকে শাহজাদা শাহদৌলা ইয়েমেন থেকে ভাটির দেশে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে বুখারার প্রখ্যাত ধর্মবিদ হযরত জালাল উদ্দিন বুখারি (র.) এর সাথে দেখা করেন। তিনি শাহদৌলাকে উপহারস্বরূপ একজোড়া জালালি কবুতর দেন। শাহদৌলা সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর যাত্রা শুরু করেন এবং বর্তমান শাহজাদপুরের ৪ কি.মি. দূরে ধলেশ্বরী নদীর চর পোতাজিয়া নামক স্থানে তাঁর জাহাজ নোঙ্গর করে। এ চর ব্যতীত আর কোথাও ভূমির সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তা জানার জন্য তিনি কবুতর জোড়া উড়িয়ে দেন। কবুতরের দিক নির্দেশনায় শাহজাদা করতোয়া নদীর একটি চরে তাঁর সহযাত্রীগণসহ নেমে পড়েন জাহাজ থেকে।[১৪] তিনি এ স্থানে আবাস গড়ে তোলেন এবং স্বীয় আধ্যাত্মিকতার প্রদর্শনে স্বল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে 'মখদুম' বা 'দরবেশ' উপাধি লাভ করেন। তাঁর বংশীয় মর্যাদা অনুসারে পরবর্তীতে অত্র এলাকাটি শাহজাদপুর নামে খ্যাতি অর্জন করে।[১৫] হযরত শাহ মখদুমের মৃত্যুর প্রায় ষাট বছর পর সুলতান শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ ১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মখদুম শাহ মসজিদটি নির্মান করেন এবং শাহজাদপুরকে একটি বিশাল পরগনা হিসেবে ইউসুফশাহী পরগনা নামকরণ করেন।[১৬]

ব্রিটিশ আমলে সিরাজগঞ্জে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ও তদপ্রবর্তৃত কর ব্যবস্থা: হিন্দু রাজত্বকাল থেকে শুরু করে মুঘল আমলে কৃষকেরা উৎপাদিত শস্যের মাধ্যমে ভূমিকর বা খাজনা প্রদান করত।[১৭] যদিও মুঘল আমলে জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল এবং এদের দায় দায়িত্ব ছিলো সুনির্দিষ্ট। কেননা, মুঘল প্রবর্তিত নিয়মানুসারে জমিদার গ্রামের কৃষকদের জমির মালিক নন বরং জমির উদ্বৃত্ত সম্পদের উপর একটি অধিকার মাত্র; যা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অধিকারের সঙ্গে যুক্ত। গ্রামের জমির উপর ভোগদখল বা অন্যান্য ব্যক্তিগত অধিকারস্বত্ব কৃষকেরই ছিল।[১৮] মুলত এ নিয়মেই অভ্যস্ত ছিলো তৎকালীন বাংলার সমাজ ব্যবস্থা। তবে ইংরেজরা ক্ষমতা দখলের পর থেকে রাজস্ব প্রথায় নগদ অর্থ প্রদানের নিয়ম চালু হয়। ফলে উৎপাদিত শস্যের বিক্রয়মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ যখন কৃষকের ঘাড়ে চেপে বসে তখন খাজনা অনাদায়ে কৃষকের জমিতে স্থানীয় উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় অধিকার লাভ করতে শুরু করে। ফলে জমির মালিকানা হারিয়ে কৃষক হলো ভূমিদাস আর উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় হলো ইংরেজসৃষ্ট এক পরজীবী জমিদার শ্রেণি। পরবর্তীতে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গ্রামবাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন আসে।

এতদিন যে জমি কৃষকের অধিকারে ছিলো ব্রিটিশ আইনের ফলে তা জমিদারের সম্পত্তিতে পরিণত হল। অন্যদিকে জমিদারের সরাসরি শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটলো।[১৯] মূলত, মুঘল আমলে সৃষ্ট জমিদারশ্রেণী কর আদায়ের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট এলাকায় একপ্রকার

স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত; তবে কোনপ্রকার রাজ্যদ্রোহী কর্মকান্ডের জন্য সম্রাট উক্ত জমিদারকে বরখাস্ত করে নতুন জমিদারকে জমিদারি হস্তান্তরের ক্ষমতা রাখতেন। এদিকে ব্রিটিশরা জমিদারদের কোনপ্রকার রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান না করে শুধুমাত্র খাজনা আদায় করে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করে তাদেরকে কাঠের পুতুলে পরিণত করে ছিল। ব্রিটিশদের প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজস্ব বৃদ্ধি করা এবং বার্ষিক আয়কে সুনিশ্চিত করা, কেননা তারা প্রাথমিক উৎপাদকদের (কৃষক) সঙ্গে কোনো প্রকার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরি করেনি। তাই পরোক্ষভাবে কোম্পানিকে জমির ওপর জমিদারদের মালিকানাস্বত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। এতে অবশ্য জমিদারেরা আর্থিকভাবে লাভবান হতো বলেই সে সময় বহু জমিদারের উত্থান ঘটেছিল।

সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলা সুলতানী আমল থেকেই ইউসুফশাহী পরগনা নামে পরিচিত ছিলো এবং এক সময় নাটোরের রানী ভবানীর অধীনস্থ ছিল।[২০] পরবর্তীতে, ব্রিটিশ চক্রান্তের শিকার এই রাজপরিবার অর্থকষ্টে পড়লে পরগনাটি নিলামে উঠে। জানা যায়- পাঁচজন জমিদার মিলে এ ইউসুফশাহী পরগনা ভাগাভাগি করে কিনে নেয়। জমিদারগণ হলেন ১. কলকাতার ঠাকুর জমিদার, ২. ঢাকার বন্দোপাধ্যায় পরিবার, ৩. সলপের সান্যাল পরিবার, ৪. পোরজনীর ভাদুড়ী পরিবার এবং ৫. পাকরাশী পরিবার।[২১] নাটোর রাজপরিবারের আমলে এ পরগনার জমির উর্বরতার উপর খাজনা নির্ধারিত ছিলো ছয় আনা থেকে দশ আনা মাত্র। নতুন জমিদারেরা জমিদারি ক্রয় করেই নানাপ্রকারে জমির খাজনা বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ইউসুফশাহী পরগনার জমির খাজনা পার্শ্ববর্তী পরগনার খাজনার চেয়ে দ্বিগুন হয়ে উঠে এবং এতে কৃষক-জমিদার সম্পর্ক অবন্ধুজনোচিত হয়ে পড়ে।[২২] প্রথমেই, এ পরগনার জমিদারের হস্তক্ষেপ করে অত্র এলাকার জমিজমা পরিমাপের নিয়মের উপর। শাহজাদপুরে জমি পরিমাপের প্রচলন ছিল সাড়ে তেইশ ইঞ্চিতে এক হাত হিসেবে যা 'মখদুম সাহেবের হাত' হিসেবে পরিচিত।

নতুন জমিদারেরা উক্ত মাপে জমি কিনলেও খাজনা আদায়ের সময়ে আঠারো ইঞ্চিতে এক হাত হিসেব করায় বিঘা প্রতি জমির পরিমাণ বেড়ে গেলে খাজনার হারও বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও জমিদার বাড়ির বিবাহ, পূজা-পার্বণ, সরকারী বিদ্যালয়ে অনুদানের অর্থ, তীর্থ খরচ, উচ্চপদস্থদের আপ্যায়ন বাবদ খরচ, সাধারণ ভোজ্য খরচ, এমনকি কোন চাষী নতুন ঘর নির্মাণ করলে কিংবা জমিদার যখন জমিদারি তদারকি করতে মাঠে যেতেন তখনও নজরানা নামক অতিরিক্ত অর্থ দিতে বাধ্য ছিলো কৃষকেরা।[২৩] ইউসুফশাহী পরগনার জমিদারেরা আরো একটি নিকৃষ্ট নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন যা ছিলো মূলত অবৈধ করের কবুলিয়ত গ্রহণ। ব্রিটিশ কর্তৃক রোড সেস আইন জারি হওয়ার পর প্রজার সমস্ত জমিজমার পরিমান সরকারকে অবহিত করতে বাধ্য হলেন জমিদারেরা। এতে কৃষকদের উপর জমিদারের অবৈধ কর আদায়ের বিষয়াদি প্রকাশিত হতে পারে ভেবে ঐ সমস্ত অবৈধ কর প্রজাগণ স্বেচ্ছায় প্রদান করছেন এই মর্মে এক স্বীকৃতিপত্র জোরপূর্বক আদায় করা হয়

কৃষকদের কাছ থেকে। উপর্যুক্ত অনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিবাদে সিরাজগঞ্জ মহকুমার কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে চাপা অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল।

কৃষক বিদ্রোহের সূত্রপাত ও ঠাকুর পরিবারের সম্পৃক্ততা: জমিদারদের অনৈতিক করের প্রতিবাদে সিরাজগঞ্জ মহকুমাসহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যায়। কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে এটিই প্রথম বিদ্রোহ নয়। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বহু কৃষক বিদ্রোহের অভ্যুত্থান ঘটে। সুলতান মুহম্মদ তুঘলকের আমলে ১৩৩০ সালে দোয়াব অঞ্চলে রাজস্ব বৃদ্ধির কারণে বিদ্রোহ হয়েছিলো।[২৪] মূলত, প্রচলিত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনই কৃষক বিদ্রোহের প্রধান কারণ।[২৫] প্রথমেই কৃষকরা অবৈধ কর অনাদায়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। এর ফলে জমিদারদের পোষ্য বাহিনী সশস্ত্র হামলা চালায় কৃষকদের উপর এবং সিরাজগঞ্জ মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর জমিদারদের অত্যাচার নিপীড়নের কথা জানিয়ে ১৮৭২/৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১ জুলাই প্রায় ২৬৯ টা গ্রামের কৃষকেরা সিরাজগঞ্জ কোর্টে মামলা করেছিলো।[২৬] যার প্রতিউত্তরে পাল্টা হামলাও হয়েছিল। কৃষকরা জমিদার বাহিনীর আক্রমনের বিপক্ষে এবং 'মখদুম সাহেবের হাত' এর পরিমাপ পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য পাবনার নিম্ন আদালতে মামলা করলে রায় কৃষকদের পক্ষেই এসেছিল। ফলে তারা অবৈধ কর সমূহ বাদ দিয়ে জমির প্রকৃত খাজনা নিম্ন আদালতে জমা দিতে থাকে। এতে জমিদারদের মাঝে হিংসাত্বক মনোভাব দেখা দেয়। তাঁদের পোষ্য বাহিনীর হাতে কৃষক পক্ষের একজন সাক্ষী অপহৃত হলে কৃষকরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। জমিদার বাড়ী লুণ্ঠন পূর্বক আগুন লাগিয়ে দেয়ার মত দুঃসাহসিক কাজে জড়িয়ে পড়ে কৃষকেরা।

পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎকালীন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট পিটার নোলান বহু কষ্টে অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন এবং অপরাধীদের শাস্তি প্রদানে বাধ্য হন।[২৭] যদিও কৃষকদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সীমিত তবুও ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকায় তারা উৎসাহী হয়ে উঠে। কারণ, তারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে নয়, বরং খাজনার পরিমান নিয়ে সৃষ্ট বিরোধ মিমাংসার জন্য আন্দোলন করেছিলেন। তাছাড়া লর্ড কর্ণওয়ালিশ যে আশা নিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছিলেন যেমন- জমিদারগন কৃষক ও কৃষির উন্নতিতে মনোযোগী হবেন, জমিদারেরা এ বিষয়টি সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছেন বলে প্রতীয়মান হয় কৃষকের প্রতি তাঁদের আচরনে।[২৮] ফলে কৃষকেরা গোপনে একত্রিত হতে থাকে এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়াতে থাকে। ১৮৭২ সালের মে ও জুন মাসে এ আন্দোলন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তারা খাজনা আদায়ে নিয়োজিত জমিদারদের লোকজন দেখলেই লাঠিসোটা নিয়ে তেড়ে যেত।[২৯] এরই মধ্যে শাহজাদপুর ডিহির জমিদার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জমির খাজনা বিঘা প্রতি এক টাকা দশ আনা ধার্য করেন। এতে উক্ত এলাকার কৃষকেরা খাজনা অনাদায়ের সিদ্ধান্ত নেন।[৩০] কৃষকদের এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিরাজগঞ্জ মহকুমার দৌলতপুর গ্রামের বাসিন্দা ঈশানচন্দ্র রায়।[৩১]

১৮৩৪ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর তের টাকা দশ আনার বিনিময়ে শাহজাদপুর ডিহির জমিদারি নিলামে কিনে নেন, এবং খাজনা আদায়ের জন্য একজন ইংরেজ ম্যানেজার নিয়োগ দিয়েছিলেন। জানা যায়, জমিদার হিসেবে দ্বারকানাথ ঠাকুর মোটেও প্রজাহিতৈষী ছিলেন না এবং খাজনা আদায়ের জন্য প্রজা নিপীড়নও করেছিলেন। মূলত, তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান দেশীয় ম্যানেজিং এজেন্ট। ব্যবসা এবং জমিদারতন্ত্রের মাঝামাঝিতে অবস্থান করার ফলে তিনি স্বভাবজাত জমিদার হয়ে উঠতে পারেননি। ১৮৬৪ সালে বিদেশে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারির মালিকানা লাভ করেন।[৩২] মূলত তাঁর আমলেই শাহজাদপুরে প্রজা বিদ্রোহের সূচনা হয়।[৩৩] এ বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষকেরা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন এবং ঈশানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে তাঁরা বুদ্ধিমত্তার সাথে আন্দোলন চালাতে থাকেন। ঈশানাচন্দ্র নিজেই একজন তালুকদার ছিলেন; তাঁর মেধা, বিচক্ষনতা ও শিক্ষাদীক্ষার কারনে কৃষকদের নেতা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আইন সম্পর্কে ভাল জানতেন বিধায় কৃষকদের আইনগত পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করতেন। তাঁর এগারো সদস্য বিশিষ্ট বিদ্রোহী পরিষদের সকলেই অত্যন্ত চৌকষ ভাবে বিদ্রোহ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।[৩৪]

প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্রোহ চলাকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেশকিছু কর্মকাণ্ড জনসাধারণের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রজাসাধারণের খাজনার টাকায় ঠাকুর জমিদারির অন্তর্ভূক্ত বিরাহিমপুরে যে গোপীনাথ মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছিলো সেটির মূল্যবান তৈজসপত্র ও গোপীনাথ বিগ্রহের মূল্যবান অলংকারাদি রক্ষা করার অজুহাতে কলকাতার ঠাকুর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়; যা আর কখনো ফেরত আসে নি।[৩৫] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হিন্দু সমাজে আপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; সেটি হলো, ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার ও প্রসার ঘটানো। আমরা সকলেই জানি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম পুরাধা এবং তিনি ধর্মীয় বহু প্রাচীন রীতিনীতি পালন করতেন না। যখনই তিনি শাহজাদপুরসহ অন্যান্য জমিদারি দেখতে আসতেন তখন মূলত তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচার করতেন; যদিও এটি কৃষক বিদ্রোহের সাথে সম্পৃক্ত নয় তবুও পরোক্ষ একটি কারণ হিসেবে সুক্ষ্ম নেতিবাচক প্রভাব বিদ্রোহীদের গোচরীভূত হয়।[৩৬] উক্ত দুটি বিষয়ের সাথে যুক্ত হয় তরকারি বিক্রির কর তোলা; গাছ লাগানোর কর চৌথ; ঘাটে নৌকা রাখার কর, ঘোড়াগাড়ি রাখার কর সহ ধুলট, করালি, জেলে জমা, শাসন জমা নামক অদ্ভুদ কিছু করের বোঝা।[৩৭]

স্বাভাবিকভাবেই প্রজাগণ এর বিরোধিতা করেছিলেন এবং ঈশানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত এ বিদ্রোহকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ নামেই সমধিক পরিচিত) স্থানীয় সংবাদপত্র 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় ঠাকুর পরিবারের নানা অত্যাচারের কথা অত্যন্ত বিশদভাবে তুলে আনেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কটাক্ষ করে কাঙ্গাল হরিনাথ লিখেছিলেন "ধর্ম মন্দিরে ধর্মালোচনা আর বাহিরে আশিয়া মনুষ্য শরীরে পাদুকা প্রহার, এ কথা যে আর গোপন করিতে পারিনা।"[৩৮] তিনি আরো উল্লেখ করে

লিখেছেন- "এখনও সর্দার দিয়া প্রজা ধরিয়া আনা হয়। জুতালাঠি প্রহার করা হয়, জরিমানা করা হয়, পিতৃমাতৃ উচ্চারণ করিয়া গালি দেয়া হয় ইত্যাদি। ঠাকুর জমিদারির 'নায়েব' প্রকৃতির আমলাগণ প্রজার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্তপান করিবার একটি মহারাক্ষস।"[৩৯] দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশে হরিনাথ মজুমদারকে হত্যার জন্য পেশাদার গুন্ডা নিযুক্ত হয়েছিলো বলেও জানা যায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সম্পাদক জনধর সেনের লেখায়।[৪০] যাই হোক, তৎকালীন বাংলার এ বিদ্রোহ ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল উপমহাদেশে।

বেশকিছু অভিজাত পত্র পত্রিকা যেমন- হিন্দু প্যাট্রিয়ট, পাইওনিয়র পত্রিকা এ বিদ্রোহকে সুযোগসন্ধানী গুটিকয়েক লোকের কূটকৌশল বলে আখ্যা দিয়েছিল; গ্রামের সহজ সরল অসহায় প্রজাদের এহেন হীন কাজে বাধ্য করা হয়েছিল বলেও দাবি করেছিলো অনেক পত্রিকা। কেননা, ১৮৪২ সালের কৃষক বিদ্রোহকে ফরায়েজী আন্দোলনের প্রভাব-পুষ্টও বলা হয়েছে।[৪১] তৎকালীন পূর্ব বাংলার বহু নিম্নমানের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন; ফলে, পূর্ব ধর্মের বহু আচরণ এসব নও মুসলিমদের মধ্যে বহমান থাকায় ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে হাজী শরীয়তউল্লাহ অবশ্যই পালনীয় ধর্মীয় বিষয়গুলোকে (যা ফরয হিসেবে পরিচিত) নিয়ে সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে এটি কৃষক বিদ্রোহে রূপ নেয় এবং জমিদার-নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ করাও এ আন্দোলনের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিলো। যদিও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পিটার নোলানের প্রদেয় রিপোর্টে ১৮৭২ সালের কৃষক বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্রও পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে মীর মোশাররফ হোসেনের উপন্যাস 'জমিদার দর্পন' পরোক্ষভাবে প্রজাদের সমর্থন করেছিল। এছাড়া 'সুলভ সমাচার', 'ভারত সংস্কারক', 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' সহ 'Peoples Friend', 'Indian Mirror', 'Bengal Magazine' প্রভৃতি ইংরেজি পত্রিকাগুলোও প্রজাদের এই নৈতিক বিদ্রোহের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছিলো।[৪২]

বিদ্রোহ দমন ও দমন পরবর্তী চূড়ান্ত ফলাফল: প্রজা বিদ্রোহের চূড়ান্ত পর্যায়ে দেখা যায় জমিদারদের অনুচরেরা যেমন বিদ্রোহী কৃষকদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিলো, নারীর সম্মানহানি করেছিলো তেমনি কৃষকরাও জমিদার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিলো। শান্তিপূর্ণ বিদ্রোহ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তা আদতে সম্ভব হয়নি। যদিও এ বিদ্রোহে সিরাজগঞ্জ মহকুমার কোনো ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়নি, এমনকি জমিদার বাড়িতে কোনপ্রকার চুরি হয়েছে বলেও জানা যায়নি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পিটার নোলানের প্রদেয় রিপোর্টে।[৪৩] বহু জমিদার তাদের অর্থকড়ি ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কলকাতায় গিয়ে অবস্থান নিয়েছিলো বলে জানা যায়। জমিদারদের মধ্যে বিশেষ করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বারংবার অভিযোগের প্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রজাদের উপর ঠাকুর বাড়ির অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় ইংরেজ লেফটেন্যান্ট গভর্ণর মি. ক্যাম্বেল পরিস্থিতি অবলোকনে সিরাজগঞ্জে উপস্থিত হন। এরই মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পিটার নোলান পরিস্থিতি সামাল দিতে বহু সংখ্যক পুলিশ নিয়ে বিদ্রোহের কেন্দ্রগুলি টহল

দিতে থাকেন। আবার বিভাগীয় কমিশনারের নির্দেশে রাজশাহী হতে চল্লিশ জন অতিরিক্ত পুলিশ প্রেরণ করা হয়েছিল। গোয়ালন্দ হতে বাংলার বড় লাটের আদেশে বিশাল এক পুলিশ বাহিনীও সিরাজগঞ্জে পাঠানো হয়েছিল বলে জানা যায়।[৪৪]

এ পুলিশ বাহিনী ঠাকুর বাড়ির ক্রমাগত দাবির মুখে কৃষকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয় এবং ঈশানচন্দ্র রায়ের নামে ওয়ারেন্ট জারি করে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছিলো, যদিও বিচার প্রক্রিয়ায় তিনি মুক্তিলাভ করেছিলেন।[৪৫] এমতাবস্থায় ১৮৭৩-১৮৭৪ সালে সমগ্র উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।[৪৬] জনসাধারণ যেমন এ দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তেমনি জমিদাররাও প্রজাপীড়ণসহ বিভিন্ন প্রকার অবৈধ কর আদায় সাময়িকভাবে বন্ধ করায় প্রজারা মনে করেছিলো জমিদারেরা পরাজিত হয়েছে। এতে বিদ্রোহ শান্ত হয়ে আসে এবং প্রজারা পরবর্তী তিন চার বছর জমিদারকে খাজনা প্রদানের অস্বীকৃতি জানিয়ে নিম্ন আদালতেই ন্যায্য খাজনা প্রদান করত।[৪৭] এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টারের বরাতে জানা যায়-'হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান সামান্য হইলেও তাহারা (পাবনার বিদ্রোহী কৃষক) দৃঢ়সংকল্প হইয়া জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, তাহারা আইনের মাধ্যমে এক কৃষি বিপ্লব সফল করিয়া তুলিতেছে'।[৪৮]

প্রজা বিদ্রোহের পরিস্থিতি যাচাইয়ের জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত তদন্ত কমিশন যেন প্রজাদের পক্ষে কোন আইন প্রণয়নে সুপারিশ করতে না পারে সেজন্য ঠাকুর পরিবারের নেতৃত্বে অন্যান্য জমিদারেরা বহু তৎপরতা চালায়। এমনকি জমিদারেরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসনের মাধ্যমে জমিদার-প্রজা সম্পর্কের ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা শুরু করে প্রচার করতে থাকে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধারা সরকার ও জমিদার শ্রেণীর মধ্যে যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বর্তমানের সরকারি সিদ্ধান্তটির মাধ্যমে বরখেলাপ ঘটবে।[৪৯] তবে এ বিদ্রোহের গ্রহণযোগ্যতা অনুধাবন করে মি. জর্জ ক্যাম্বেল সরকারকে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন প্রণয়নে সুপারিশ করেন। তাঁর আমলে আইনটি প্রনীত না হলেও ১৮৮৩ সালে মি. ইলবার্ট একটি আইন তৈরি করেন যা পরিমার্জিত হয়ে ১৮৮৫ সালের ১৪ মার্চে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন হিসেবে প্রণীত হয়।[৫০] এ আইন বাংলার প্রজাসাধারণকে অবৈধ করের বোঝা থেকে শুধু মুক্তি দেয়নি বরং ভূমির উপর প্রজার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। বহু ত্যাগ, লাঞ্ছনা আর সংগ্রামের পর অর্জিত হয়েছিল এ সাফল্য।

উপসংহার: লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগ নিয়ে দেশীয় জমিদারেরা প্রজাদের উপর অবৈধ করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে বহুবছর ধরে যে অন্যায় অত্যাচার চালিয়ে আসছিল তার প্রতিবাদে তৎকালীন সিরাজগঞ্জ মহকুমার শাহজাদপুর ডিহির প্রজাসাধারণের রুখে দাঁড়ানো এবং জমিদারদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বিদ্রোহ চালিয়ে যাওয়ার এক অনন্য সাধারণ অর্জন ছিল ১৮৮৫ সালের 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব' বিল। এ বিল শুধু

শাহজাদপুর নয় বরং বাংলার অন্যান্য জেলার কৃষকদের যৌক্তিক আন্দোলনকে সফলতা এনে দিয়েছিল। শিক্ষিত মানুষের সমর্থন এ বিদ্রোহকে সময়োপযোগী বিদ্রোহে রূপান্তরিত করেছিল। ঈশানচন্দ্র রায়ের মত আইনজ্ঞ ব্যক্তি, কাঙাল হরিনাথের মতো বিচক্ষণ সাংবাদিক, মীর মোশাররফ হোসেনের মত সু-সাহিত্যিক তাঁদের কথায়, প্রকাশনায় এ বিদ্রোহের যৌক্তিকতা তুলে আনেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সামনে। এমনকি অত্যাচারী ইংরেজ সরকারও বিদ্রোহের যৌক্তিকতা অনুধাবন করে জমিদারদের অমূলক আচরনের বিরোধিতা করে। মূলত এ বিদ্রোহে আমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি যার ফলাফল ছিলো সুদূর প্রসারী। যুগে যুগে মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং বহু ত্যাগের বিনিময়ে সফলতা এসেছিল। সিরাজগঞ্জের এ কৃষক বিদ্রোহও দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনন্য সফলতা হিসেবে ইতিহাসে স্বীয় স্থান তৈরি করে নিয়েছে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, (কলকাতা: বুক ওয়ার্ড, ১৯৮৭), ৩৪৬।

২. রাধারমণ সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪), ২৩২।

৩. শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা- সিরাজগঞ্জ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৪), ২৪।

৪. *প্রাগুক্ত*।

৫. আখতার উদ্দিন মানিক, *সিরাজগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, (ঢাকা: গতিধারা, ২০১৬), ১৯।

৬. *Bengal District Administration Committee (1913-1914) Report,* (Culcutta: Bengal Secretariat Press, 1915), 42

৭. *Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Eastern Bengal And Assam,* (Calcutta: Superintendent of Government Printing, 1909), 284.

৮. শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা- সিরাজগঞ্জ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৪), ২৪।

৯. আখতার উদ্দিন মানিক, *সিরাজগঞ্জ জেলার ইতিহাস*, ২০১৬, ১৯।

১০. শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা- সিরাজগঞ্জ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৪), ২৫।

১১. *প্রাগুক্ত*, ২৬।

১২. আশরাফ পিন্টু ও আখতার উদ্দিন মানিক, *শাহজাদপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, (ঢাকা: গতিধারা, ২০২০), ৪৩-৪৪।

১৩. *প্রাগুক্ত*।

১৪. *Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, Eastern Bengal and Assam,* (Calcutta: Superintendent of Government Printing, 1909), 285.

১৫. আখতার উদ্দিন মানিক, *সিরাজগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, (ঢাকা: গতিধারা, ২০১৬), ৫২৯।

১৬. আশরাফ পিন্টু ও আখতার উদ্দিন মানিক, *শাহজাদপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ২০২০, ৭০।

১৭. শ্রীবামাচরণ মজুমদার, *বাঙ্গলার জমিদার*, (ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০১৭), ১৯।

১৮. গৌতম ভদ্র, *মুগলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ*, (কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৮৩), ১৯, ২৪।

১৯. হামজ আলত্তী, অনু: এনামুল হাবীব, *ভারতবর্ষ সামন্তবাদ থেকে উপনিবেশিক পুঁজিবাদে উত্তরণ*, (ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০১৮), ৩০।

২০. মাহবুব- উল- আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, (চট্টগ্রাম: নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৬), ৩২।

২১. রাখাল চন্দ্রনাথ (সম্পা.), *আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলায় কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত*, (কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১৮), পৃ.৫৪।

২২. W.W. Hunter, *A Statistical Account Of Bengal, Districts of Murshidabad And Pabna, Vol.IX* **,** (London: Trubner & Co., 1876), 319.

২৩. আখতার উদ্দিন মানিক, *শাহজাদপুর কৃষক বিদ্রোহ ও ঠাকুর জমিদার*, (ঢাকা: অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ২০১৪), ৩১।

২৪. ইরফান হাবিব, *ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে*, (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯), ১৩১।

২৫. কমলেশ গোস্বামী, (সম্পা,), *বিদ্রোহ ও আন্দোলন উত্তরবঙ্গ*, সপ্তদশ শতকের কোচ-রাজবংশী কৃষক অভ্যুত্থান: একটি পর্যালোচনা, দেবব্রত চাকী, কলকাতা: রূপালী,২০১৩, ১০৩; আনন্দ ভট্টাচার্য, *সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ*, (কলকাতা: আশাদীপ, ২০২২), ২৮০।

২৬. রাধারমণ সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪), ২৩০।

২৭. L.S.S. O'Mally, *Bengal District Gazetteers, Pabna,* (Culcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1923), 26.

২৮. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *বাংলাদেশ নিম্নবর্গ, দ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ*, আখতার উদ্দিন মানিক, ২০১৪, (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৫), ৩৭৮-৩৭৯।

২৯. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, (কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৭), ৩১, ৬৩।

৩০. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *বাংলাদেশ নিম্নবর্গ, দ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ*, (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৫), ৩৮২।

৩১. আখতার উদ্দিন মানিক, *শাহজাদপুর কৃষক বিদ্রোহ ও ঠাকুর জমিদার*, (ঢাকা: অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ২০১৪), ৩৫।

৩২. চিত্তব্রত পালিত, অনু: সুভাষ চন্দ্র সেন, *ব্রিটিশ আমলে গ্রামবাংলা সংকেত ও সংঘাত*, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, (কলকাতা: ২০১৯), ৪৪।

৩৩. আখতার উদ্দিন মানিক, *সিরাজগঞ্জ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, (ঢাকা: গতিধারা, ২০১৪), ১৯।

৩৪. আশরাফ পিন্টু ও আখতার উদ্দিন মানিক, *শাহজাদপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ২০২০, ৭২।

৩৫. আখতার উদ্দিন মানিক, *শাহজাদপুর কৃষক বিদ্রোহ ও ঠাকুর জমিদার*, (ঢাকা: অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ২০১৪), ৩৯।

৩৬. আখতার উদ্দিন মানিক, *শাহজাদপুর কৃষক বিদ্রোহ ও ঠাকুর জমিদার*, (ঢাকা: অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ২০১৪), ৮৬।

৩৭. C. E. Buckland, *Bengal Under The Lieutenant-Governors,* Vol-I, (Culcutta: S. K. Lahiri & Co., 1901), 544.

৩৮. স্বপন বসু, *সংবাদ ও সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ*, (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, ২০০০), ৩৩৯।

৩৯. সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়, *গ্রামবাংলার গড়ন ও ইতিহাস*, (কলকাতা: অনুষ্টুপ, ১৯৮২), পৃ. ৮৪।

৪০. আবুল আহসান চৌধুরী, *কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার স্মারক গ্রন্থ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮), ২৯।

৪১. Ranajit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India,* (New Delhi: Oxford University Press, 1983), 173.

৪২. রাখাল চন্দ্রনাথ (সম্পা.), *আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলায় কৃষক অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত*, (কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১৮), ২৯৪-২৯৫।

৪৩. W.W. Hunter, *A Statistical Account Of Bengal, Districts of Murshidabad And Pabna, Vol.IX,* (London;Trubner & Co.,1876), 322.

৪৪. *প্রাগুক্ত*, ৩২৩

৪৫. আখতার উদ্দিন মানিক, *শাহজাদপুর কৃষক বিদ্রোহ ও ঠাকুর জমিদার*, (ঢাকা: অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ২০১৪), ৩৭।

৪৬. L.S.S. O'Mally, *Bengal District Gazetteers, Pabna,* (Culcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1923), 28.

৪৭. রাধারমণ সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, (কলকতা: দে'জ পাবলিসাং, ২০০৪), ১০২।

৪৮. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *বাংলাদেশ নিম্নবর্গ, দ্রোহ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ*, (ঢাকা: কথাপ্রকাশ, ২০১৫), ৩৭৬।

৪৯. প্রেমেন আড্ডি, ইবনে আজাদ, অনু. আনোয়ারুল হক, *বিভাগপূর্ব বাংলার রাজনীতি ও সমাজ*, (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৮), ৪০।

৫০. C. E. Buckland, *Bengal Under The Lieutenant-Governors,* Vol.I, (Culcutta: S. K. Lahiri & Co., 1901), 548.